Interview details

Interview with M Haque

Interviewed by Iffat Anjum

এম হক - আসলে আমার কথা বলতে গেলে যেটা হয় যে এখনো পুরোপুরি আমরা আমাদের পরিবারের সবাই বাংলাদেশে এসে পৌছায় নাই। এবং প্রোবাবলি আর কখনো আসা হবে না। তাই আমাকে মাঝে মাঝেই ইন্ডিয়াতে যেতে হয়। তো পরিবারের গল্প বলতে আমার ইন্ডিয়াতে যেয়েই শোনা। পরিবারের বেশিরভাগ মানুষই ওই দিকেই থাকে। এখানে নেই। এখানে আমাদের বলতে মামা আছে, দুই মামা, যারা আমাদের কুষ্টিয়ার পাশে মেহেরপুরে থাকে, আমরা আছি, আমার বোন আছে, তার মানে আমরা তিন ভাই, আর এখানে দুই মামা, এই হচ্ছে আমাদের ব্লাড কানেক্টেড আত্মীয়-স্বজন। এছাড়া আর একটু দুঃসম্পর্ক আছে। খালু আছেন এখানে, আপন খালু। তার ছেলে মেয়েরা আছে। তো তাদের কাছ থেকে যতটুকু শোনা বা বেশিরভাগ শোনাটাই হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে, বা দেখা। তো দেখা যদি বলতে হয় তাহলে পরে ওদের কালচার বা আমাদের কালচারতো ডিফারেন্ট। তো আমার চলে আসা হচ্ছে ১৯৮৭ এর ফেব্রুয়ারির দিকে। তো '৮৭ এ আমি এখানে এসে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হই। কুষ্টিয়ারই একটা গ্রামে আমার বোনের বাড়ি যেখানে। তো আমার দেখা হচ্ছে ইন্ডিয়ার কালচারাল ডিফারেন্স আর আমাদের কালচারাল ডিফরেন্স অনেক। বিশেষ করে মানসিকতার। তো মানসিকতা এগুলা মনে হয় যে ওরা অনেকটাই মনে হয়েছে যে ম্যাটেরিয়ালিস্টিক। মানে একেবারে বিষয়ভিত্তিক। এখানে আমরা, যেমন আমাদের মানসিকতার অনেক পরিবর্তন আমার কাছে মনে হয়। যেমন আমরা মানবিক মূল্যবোধের জায়গাটা অনেক উদার। সেক্ষেত্রে ওদের ওখানে আমার কাছে মনে হয় না সেটা ওরকম মানবিক মূল্যবোধ খুব বেশি উদার। বেশ কনজারভেটিভ। এই টাইপের পার্থক্যই, আর এমনি সামাজিক পার্থক্য বলতে ওরা ওদের মত করেই চলে, ওদের মত করে চলা বলতে বুঝাচ্ছি যে ওদের মানসিকতা একেবারেই কঞ্জাস্টেড আমার কাছে মনে হয়। আমার জীবন দিয়ে

বোঝা। সেক্ষেত্রে আমাদের এখানকার লোকজন অনেক বেশি উদার। এরকমই। আর গল্প বলতে আরো যদি খুব বেশি স্পেসিফিক কিছু আপনি বলতে চান বা জানতে চান তাহলে পরে সেটা আমি বলতে পারি।

ইফফাত - আচ্ছা আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে '৪৭ সালে যে পার্টিশনটা হয়েছিল ওই টাইমে কি আপনার কোন আত্মীয় স্বজন কিংবা আপনার ফ্যামিলির কেউ এপারে মুভ করেছিল?

এম হক - আমাদের ১৯৪৭ তে মুভ করেনি । যেটা হয়েছিল যে ১৯৪৭ এ যখন দেশভাগ হয় তখন আমি আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছি যে উনিও সেই মিছিলে অংশগ্রহন করেছিলেন, আনন্দ মিছিলে। আর আমাদের যে এলাকাটা সে এলাকায় অলরেডি পাকিস্তানের পতাকা নিয়ে তারা মিছিল করেছে যে এটা পাকিস্তানের সাথে এড হয়ে যাচ্ছে। তো সেভাবে সময় যখন আনন্দ মিছিল করল এবং তার পরবর্তিতে যখন রিয়েলি জানতে পারল যে না ওই এলাকাটা তখনো ভারতের মধ্যে রয়ে যাচ্ছে এবং আলটিমেটলি তাই গেছে । এবং গল্প শোনা যায় এরকম যে ওইখানে সম্ভবত মুর্শিদাবাদের যে ইয়ে ছিল, সম্ভবত কাজেম আলি মির্জা সামথিং এরকম কিছু হবে, উনার বাবা কোনভাবেই হোক, ভারত সরকারের সাথে কমিউনিকেট করে ম্যাপ ছিল এরকম যে এখন যে ম্যাপটা আছে পদ্মা নদীর পাশ দিয়ে জলঙ্গি বা ওই সাইড দিয়ে মানে নদিয়ার আশপাশ দিয়ে পদ্মা নদীর এখন যে ভাগ সে ভাগটা এটা পিছিয়েছিল, হচ্ছে গঙ্গা যেটা বলে বহরমপুরের উপর দিয়ে যেটা গঙ্গা গেছে সেই গঙ্গা নদিয়ায় এই সাইডটা আসার কথা ছিল হচ্ছে পাকিস্তানের সাথে এড হওয়া।

ভারত যখন ভাগ হয় '৪৭এ তখন পাকিস্তানের সাথে এই সাইডটা এই দিকে চলে আসবে তো সেই হিসাবে তারা মনে করেছিল এটা পাকিস্তান হয়ে যাচ্ছে এবং সে আনন্দ মিছিলও বের হয়। পরবর্তীতে জানে যে হয়নি এবং ফলশ্রুতিতে যেটা হয়েছে যে আমাদের আত্মীয়-স্বজন যেহেতু এই কেন্দ্রিক সো আমাদের বেশ কিছু

আত্মীয়-স্বজন এবং তাদের সম্পদ এইদিকে চলে আসছে নদীর এপারে। এবং যার কারণে আমার নানাদের চলে আসা, আমার মামার এখানে থাকা। আমার খালুদের এখানে চলে আসা। তো শুধুমাত্র এই সম্পত্তির কারণে। তো সম্পত্তি আমাদের ডিভাইড করে দিয়েছে। এবং আমাদের আসার ইতিহাস হচ্ছে যে আমরা যখন ১৯৭৮ এর দিকে সম্ভবত গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হয়, যেটা আগে ছিল হচ্ছে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট ওইটা পরবর্তীতে বামফ্রন্ট। আমি সালটা এক্যুরেট বলতে পারব না, বাট আমার মনে হয় '৭৮ এর দিকে । তো সেই সালটার সময় আমরা কংগ্রেসের সাথে অনেকটা যুক্ত ছিলাম। আমাদের পরিবারের ম্যাক্সিমাম লোকজনই মোটামুটি পলিটিকালি এস্টাব্লিশড ছিলো। ওই এলাকায় তখন প্রেসিডেন্ট বলা হত। তো আমাদের নানা, নানা ছিলো প্রেসিডেন্ট। আমার চাচা ছিলো প্রেসিডেন্ট। ওই এখানে যেটাকে ইউনিয়ন পরিষদ বলা হয়। ইউনিয়ন পরিষদে যেমন চেয়ারম্যান, ওখানে তখন গ্রাম পঞ্চায়েত ছিলো। গ্রাম পঞ্চায়েতের আগের যে সিস্টেম ছিল তা হচ্ছে সিলেকশান সিস্টেম। কংগ্রেস যারা এলাকায় মোটামুটি প্রভাব রাখত তাদেরকে সিলেক্ট করে দিত যে এরা উন্নয়ন করবে এবং প্রশাসনিক কমিউনিকেশানটা ওদের মাধ্যমে হবে। তো চাচা ছিলো প্রেসিডেন্ট, আমার নানা ছিল। তার আগে আমার দাদার বড় ভাই ছিল। তো এর পরে যখন চেঞ্জ হল সরকার, সরকার চেঞ্জ হবার পরে কিছু সম্পত্তিগত বিষয়ের কিছু পরিবর্তন আসল। পরিবর্তন বলতে যে, প্রথমে ছিল ৭২ বিঘা সম্পত্তি রাখার পরে সব সম্পত্তি এটা গভর্নমেন্টকে দিয়ে দিতে হবে, ভেস্ট হয়ে যাবে। এবং সেটা ভূমিহীন যে কৃষক ছিল সে কৃষককে বিলি করে দিবে। তো '৭৮ এ সরকার চেঞ্জ হবার পরে আমি তখন অনেক ছোট। তখনও আমি কিছু বুঝতাম না, বুঝতে শিখিনি। '৮০ সালের দিকে বা '৮২ / '৮৩র দিকে আমি তখন মোটামুটি, আমার কিছু কথা মনে পড়ে। তখন দেখতাম যে গ্রামে মিছিল হত। তো মিছিল হলে তখন দেখা গেল যে লোকজন আসত। এসে এসে মিছিল করত এবং মিছিলের স্লোগান আগে স্লো হত। বাট আমাদের বাড়ির সামনে এসে জোরে হয়ে যেত এবং আমার বাবার নাম ছিল রেজাউল হক, তো ওখানে দেখা গেলো বলত রেজাউলের কালো হাত, ভেঙ্গে দাও, গুঁড়িয়ে দাও। আমি

শুনতাম। তখন আমি খুব ছোট ছিলাম, এখন কালো হাত আমি বুঝতাম না, কালো হাত কাকে বলে। তখন আমি বুঝতাম যে আমার বাবা তো এত কালো না, তাইলে কালো হাত কেন বলে। তখন আমি মিলাতে চেষ্টা করতাম , ছোট তো। তো কাউকে বলতামও না। তো আমি দেখতাম যে হাতের এই কনুই এর জায়গাটা আমার কাছে মনে হইসে কালো । তো এই কালো হাত হইছে যারা মিছিল করে তাদের হাত তো আরো কালো। তাইলে কেন এই কালো হাত ভেঙ্গে দিতে বলা হবে। তো যাই হোক, পরবর্তীতে আমাদের আব্বা চিন্তা করেছিলো যে এভাবে আসলে থাকা যাবে না, যেভাবে অত্যাচার হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু এখানে কিছু আছেই আত্মীয়-স্বজন সো টোটালটাই শিফট করে বাংলাদেশে নিয়ে চলে আসবে। তো সেই সেন্সেই এখানকার যারা হিন্দু চলে যেতে চায়, তখন তো বর্ডার ওপেন ছিলো। চলে যেতে চায়, তো তাদের সাথে কমিউনিকেট করা হল। তো আমাদের এলাকাটা বেসিক্যালি মুসলিম প্রধান। তো আমরা কিছু জমি ট্রান্সফার করেছিলাম। জমি ট্রান্সফার করার পরে আমাদের আর বেশ কিছু জমি ওখানে রয়ে যায়। তো রয়ে যাওয়ার পরে আমরা আর কয়েকজনের সাথে মোটামুটি কথা হয়েছিলো। তার মধ্যে একজনের সাথে প্রায় ফাইনাল হয়ে গিয়েছিলো। তো এরা যাওয়ার পরে ওই এলাকা দেখার পরে তারা আর নিতে চায়নি। কারণ ওরা যে সুবিধার জন্য এ দেশ ছেড়ে ওইদেশে যাবে, ওইখানে যেয়ে সে ওখানে আর ওই পরিবেশ পাবে না। কারণ পুরাটাই মুসলিম দিয়ে ঘেরা। ইভেন এরকম রেফারেন্স যে আমাদের সাথে যারা গিয়েছিলো আরও কিছু আমাদের সাথে যাদের পারিবারিক, মানে ম্যাচ করে না এমন পর্যায়ের লোকও গিয়েছিলো। যাদের সাথে জমি ট্র্যান্সফার করসি। তো তারা আবার আমাদের জমি আমাদের কাছে ফেরত দিয়ে নদিয়ার দিকে চলে যায়। কারণ ও এসে এখানে ফেভার পায়নি। বরং এখানকার চেয়ে ওখানে সে আরও খারাপ ছিলো। ওখানে যেয়ে। তো পরে আমাদের আর ওইভাবে ট্র্যান্সফার হয়ে আসা হয়নি। যার ফলে আমারা দুই ভাই আর এক বোন বিবাহ সুত্রে এখানে চলে আসছি। এটাও আবার কাহিনী আছে যে ১৯৭১ যখন এখানে মানুষজন কিছু ওইদেশে শেল্টার নিয়েছিলো সেই শেল্টারের সময় আমরা আশ্রয়

দিয়েছিলাম। আশ্রয় দেওয়ার পর সেখান থেকে দেখা গেল একটা ফ্যামিলি কমিটমেন্ট ছিল। আমরা যেহেতু এরকম মানুষের সাথেই এরকম ইয়ে করছি, মানে কি বলব অবদান বলতে পারেন। তো সেখান থেকে তারা আমাদের পছন্দ করেছিলো, তো আমারই খালা সে বলেছিল যে আমি তোমাদের বাড়ির একটা মেয়ে আমাদের বাড়িতে নিব। সে হিসাবে আমার খালাতো ভাইয়ের সাথে আমার বোনের বিয়ে। তো এরা চলে আসল। তো আলটিমেটলি এ কারণে আমাদের আর সবার আসা হয়নি। এজন্য আমাকে মাঝে মাঝে যেতে হয়। এ হচ্ছে আমাদের গল্প।

ইফফাত - আচ্ছা আপনার মামাদের ক্ষেত্রে বললেন যে সম্পত্তির কারণে এবং আপনার ক্ষেত্রেও বললেন পলিটিক্যাল কিংবা অন্যান্য কারণে যে সেটেলমেন্টটা হয়েছিলো এপাশে, তো আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে আর্লি সেটেলমেন্ট পিরিয়ডে কিংবা পরবর্তীতেও যে, মানে আপনারা যে মুভটা করলেন তারপর এখানে এসে প্রারম্ভিক জীবনটা কেমন ছিলো, বা এটা কি রকম ছিল? বা কি ধরনের সিচুয়েশান ফেস করেছেন তখন?

এম হক - আচ্ছা। প্রথমে হচ্ছে, আব্বা চিন্তা করেছিলো যে আমরা চার ভাই। চার ভাই এর মধ্যে মেজ ভাইকে নিয়ে আসবে। আর তার ইমিডিয়েট যে সেজো, আমার চাইতে সে ৫ বছরের বড় তাকে নিয়ে আসবে। মেজ ভাই যখন এদেশে আসে তখন সে ওখানে অলরেডি ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছে। তো পাস করে আসার পরে তো এখানে যখন সে ভর্তি হতে যায় তখন ন্যাশন্যালিটি প্রব্লেম দেখা দিল। ন্যাশন্যালিটি প্রব্লেম এ যেটা হবে যে পরবর্তীতে গভর্নমেন্টের অনেক বিষয়েই সে আর ঐভাবে ফ্যাসিলিটি বা ব্যারিয়ার দেখা গেলো আসতে পারে। তো এখানে ক্লাস নাইনকেই মোটামুটি কোনকিছুর রেজিস্ট্রেশান হিসাবে ধরা হয়। মানুষের বেস ধরা হয় এডুকেশনালি তো আমার কাছে মনে হয় ক্লাস নাইন। তো পরে আমার ভাইও, আমার ইমিডিয়েট যে ভাই সেও তখন অলরেডি ম্যাট্রিক পাস করে গেছে। তার মানে তাকে এখানে আসলে পরে আবার সেই নতুন করে শুরু করতে হবে। তো

আমি তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি, জাস্ট সিক্স পাস করব। তখন আব্বা চিন্তা করল যে তাহলে পরে ওকে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। তো আমি কোনকিছুই জানি না। আমার কোন অনুমতি নাই, বা কোন আলোচনা নাই। সরাসরি আমাকে বলল তোকে বাংলাদেশে যেতে হবে। তো বাংলাদেশে, কোন কথা নাই, আব্বাকে প্রচণ্ড ভয় পেতাম। তো আর কথা বলার সাহস হয় নাই। তো সরাসরি চলে আসলাম। তো এখানে আমার যে বোনের বাড়ি তা একেবারে বর্ডারে। কুষ্টিয়ার একেবারে বর্ডার দৌলতপুরে ঐখানে। তো যেহেতু মোটামুটি একটু প্রভাব প্রতিপত্তি রাখে, স্কুলে ভর্তি হতে তেমন কোন অসুবিধা হয়নি।ক্লাস সেভেনে এসে এখানে ভর্তি হয়ে যাই। তো শহরে এন্ট্রি নিতে গেলেতো পরে ট্র্যান্সফার সার্টিফিকেট দরকার বা ডকুমেন্টেশন দরকার, পরে ডকুমেন্টেশন নাই তাই গ্রামে আসি। গ্রামে আসলে তখন গ্রামের স্কুলে ভর্তি হই। ওখানে সেভেন এইট ক্রস করার পরে ওখান থেকে ট্র্যান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে কুষ্টিয়াতে আমাদের বাড়ি আছে, কুষ্টিয়াতে আমরা ওখানে সেটেল হই এবং কুষ্টিয়াতে আসার পরে আমাদের বা আমার ব্যাক্তিগতভাবে কখনও কোন প্রবলেম ফেস করতে হয়নি। শুধু মাত্র এখানে কিছু কালচালার যেসব ইয়ে আছে কমেন্টস আছে সেগুলো ছাড়া। আর সেটাও খুব পারসোনালি কেউ কাউকে হিট করে না। যেমন ধরেন যারা ইন্ডিয়া থেকে আসে তাদের কালচালার ইয়ের কারণে অনেকে বলে, ঘটি টটি বলে বা অন্য অনেক কিছু বলে। মানে তারা অনেক সংকীর্ণ মানসিকতার বা নিজেদেরকে নিয়ে চলে এই টাইপের জিনিসগুলো। এটা মানে অনেক জেনারেলি বলা হত বাট পারসনালি হিট করে আমার ক্ষতি করবে এরকম করে কোন বাধার সম্মুখীন আমি কখনও হইনি।

ইফফাত - আচ্ছা। তারপরে এই যে ডিফরেন্সগুলো এটার কারণ হিসেবে তো মূলত দেশভাগটাকে ধরা হয়। তো এটাই জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনার জীবনে দেশভাগটা আসলে কি অর্থ বহন করে।

এম হক - আমার কাছে মনে হয় না দেশভাগ কোন কালচারাল ডিফরেন্স বা এর সাথে জড়িত। আমার ব্যক্তিগত মতামত। দেশভাগ হবার পরে যেটা হচ্ছে যে আমার কাছে মনে হচ্ছে দেশভাগ হলে পরে প্রত্যেকটা দেশেরই নিজস্ব কিছু পলিসি থাকে। সেই পলিসির উপর বেস করেই ওই দেশের কালচারাল সবকিছু মানে যা কিছু জীবনের সমস্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হয় সরকারের পলিসি দ্বারা। এখন যদি সরকার মনে করে যে এই রাষ্ট্রটাকে আমি সমাজতান্ত্রিকভাবে চালাবো, তার মানে প্রতিটা মানুষের জীবনযাত্রা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে। ভারতে কি হয়েছে, ভারতে দেখা গেল যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ছিল হচ্ছে ডেমোক্রেসি। আবার পশ্চিম বাংলা অর্থাৎ আমার যেখানে বাড়ি সেখানে কিন্তু ছিল হচ্ছে সোশ্যালিজম। তো সোশ্যালিজম এখানে হবার পরে কি হল এখানে সব কিছু ভাগ করে দিল। আর ওখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশের চাইতে অনেক বেশি কড়া। কড়া বলতে বলছি কন্ট্রোল বেশি। কন্ট্রোল হবার কারণে কি হচ্ছে যে এখানে যেমন ওপেন সবকিছু, ওপেন বলতে বুঝাচ্ছি যে একজন বিজনেস করছে উইদাউট এনি ট্রেড লাইসেন্স। এখানে একজন একটা ইয়ে করছে প্রাইজ ফিক্সিং করছে উইদাউট এনি পলিসি। মানে আমার এখন মনে হচ্ছে যে আমার দাম বেশি নিতে হবে, এখন ডিমান্ড বেশি সো আমি নিতে পারি। তো কোন রকম কোন দেখা গেল কনজিউমার এসোসিয়েশন এর কোন কিছু নাই, ল এর ইমপ্লিমেন্টেশন নাই। সো এই ক্ষেত্রে দেখা গেল এই যে ইনকামটা অবারিত, খরচটাও অবারিত। ইন্ডিয়াতে কিন্তু যদি আপনি মনে করেন, আমার তখনকার দৃষ্টিভঙ্গি বলছি যে, সে ফর আমি একটা সরকারের পরিবর্তনের কথা শুনেছি এরকম যে শুধুমাত্র পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির কারণে ওই এলাকার সরকার চেঞ্জ হয়েছে। কারণ কি? কারণ পেঁয়াজের দাম ১০ টাকা, আমি এগজ্যাক্টলি মনে করতে পারছি না, দেখা গেলো ২০ টাকার পেঁয়াজ ৪০ টাকা বা ৬০ টাকা আসলো। কেন হবে, গভর্নমেন্ট কি করছে? এই জবাবদিহিতার সচেতনতা জনগণের মধ্যে আছে। ঐখানে দেখা গেল যে একজন, সে ফর এখান থেকে মোহাম্মাদপুর বাসস্ট্যান্ড এর ভাড়া ২০ টাকা হওয়া উচিত, রিক্সাভাড়া। এখন আমার কাছ থেকে ৫০ টাকা দাবি করলে আমি কিন্তু চিন্তা করব আচ্ছা ৫০

টাকা তো, এক দিনই তো, আমি দিয়ে চলে যাব। আমি এখানাকার মেন্টালিটির কথা বলছি, ঐখানে কিন্তু সে সেই চিন্তা করবে না। আমি আজকে যদি দেই তাহলে সে কালকে আবার জিজ্ঞেস করবে। তখন বলবে ৫০ না, ৬০ দিতে হবে। বা এটলিস্ট ৪০ ধরবে। কিন্তু আমি যদি আজকে না দেই তাহলে আজকের ২০টা ২০ই থাকবে। এভাবে ওরা চিন্তা করে সো ওদের ইনকাম করাও খুব কঠিন। যার কারণে ওরা সব কিছু চিন্তা করে ঐভাবে। ওরা আমার কাছে মনে হয়েছে যে ১০ টাকা ইনকাম করলে ওখান থেকে পরে হয়ত ১২ টাকা তার খরচ। আমাদের এখানে দেখা গেল ১২ টাকা খরচ হলেও আমারা কিন্তু যেভাবেই হোক ১২ টাকাই খরচ করি। ও যদি ১০ টাকা ইনকাম করে তাইলে ৮ টাকা খরচ করা আর ২ টাকা সেভিংস এ যাবে। পার্থক্য হচ্ছে এই। কারণ তার ওই ইনকাম করাটা কঠিন আমার কাছে মনে হয়েছে। আমাদের ইনকাম করাটা সহজ।

ইফফাত - আচ্ছা। আমি আবার একটু পেছনে ফিরে যাচ্ছি। আপনি বলেছিলেন যে আপনার দুই মামা এবং সম্ভবত এক খালু মানে জায়গা জমি সম্পর্কিত বিষয়ে এপারে এসেছিলেন। তো উনাদের সম্পর্কিত কোন কাহিনী বা কোন স্পেসিফিক কাহিনী যদি বলেন বা উনাদের গল্পটা।

এম হক - আচ্ছা। খালু এখনও জীবিত। খালু হচ্ছে বয়স প্রায় ৯৮ বছর। হাঁটা চলাফেরা করেন। তো খালু, আপনি যদি দৌলতপুরের কুষ্টিয়ার ওইদিককার ম্যাপ দেখেন তাহলে দেখবেন যে জলঙ্গি আর হচ্ছে দৌলতপুরের শেষ অংশ ওইদিকে একটা নদী গেছে, ওই পাশে সম্ভবত ওইটার নাম হচ্ছে, নামটা ঠিক মনে করতে পারছিনা, পাঁচের পর এমন কিছু। তো ঐখানে প্রচুর জমি ছিল। আর পড়াশোনা করত উনি বগুড়া মেডিকেল কলেজে। উনি গ্রাম্য ডাক্তার ওই যে এলএমএফ বা সামথিং কিছু এই টাইপের পড়াশোনা করত। তো বগুড়া মেডিকেলে পড়ত এখন পড়ার পরে তার এইদিকটায় বেশি রয়ে গিয়েছিলো। তো এখানে যাওয়ার পরে ওদের বাবা চলে আসে ওখান থেকে এখানটায়। বর্ডার থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে

বাংলাদেশের ভিতরে। কোন কারণে বগুড়া মেডিকেলে থাকা অবস্থায় তখন হচ্ছে আমার খালার সাথে আমার খালুর বিয়ে হয়ে যায়। এবং যেহেতু তারা টোটাল ফ্যামিলি চলে আসে এখানে সম্পত্তি নিয়ে, সে হিসাবে তারা এদেশে চলে আসছে। আলটিমেটলি যখন দেশ ভাগ হয়ে যায় ওটা ল্যান্স হয়ে গিয়েছিলো। এরকমভাবেই তারা চলে আসছে। পড়াশোনার কারণে, যেমন আমার বাবা, বাবা না, আমার নানা পড়ত হচ্ছে রাজশাহী কলেজে। আমার চাচা পড়ত রাজশাহী কলেজে। কারণ আমার বাড়ি থেকে রাজশাহী কলেজ এয়ারের ডিস্ট্যান্স যদি চিন্তা করেন তো কত এভারেজ ১৭ টু ২০ কিলোমিটার এরকম হবে। এখন তারা পড়ত আর ওইদিকে কিছু আত্মীয়-স্বজন বাট একটু দূর সম্পর্কের ডিস্টান্স রিলেটিভ। আর মামারা এসেছে, মূলত আমার এক নানা থাকে মেহেরপুরে। আমাদের পারিবারিক ইতিহাস হচ্ছে যে খুবই হিংসার ইতিহাস। আমাদের অনেক জমি টমি ছিলও। তো জমি থাকার কারণে দেখা গেলো নিজেরদের ওই যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনেক ঝামেলা হত। ঝামেলা হওয়ার কারণে চাইত আগেকার লোকজন যে আমরা যদি নিজেদের ভাইবোনকে আলাদা করে রাখি তাহলে পরে সম্পর্কটা ভালো থাকবে। সো ওখানে যদি কোন, যেমন মেহেরপুরে আমাদের একটা ছোট প্রপার্টি ছিল সে প্রপার্টি আমার বোধহয় নানার। প্রপার্টি থাকার কারণে চিন্তা করছিলো যে দুজনকে আমি ওখানে পাঠিয়ে দেই। ওখানে থাকলে পরে এই মামা ওই মামা যাতায়ায়ত করবে, দূর থেকে আসলে পরে ইয়ে করবে এক্সেপটেন্স ভালো থাকবে সেই সেন্সে পাঠিয়ে দেওয়া।

ইফফাত - কিন্তু আসার পর কি কোন ধরনের পরিবর্তন মানে উনাদের এক্সপেরিয়ান্স করতে হয়নি?

এম হক - ঐখানে আমি শুনিনি কখনও যে এখান থেকে কোন ব্যারিয়ার তৈরি হয়েছে। যেটা হত যে ভালো লাগার বিষয় বা থাকার বিষয়। আমার নিজের ছোটবেলা হচ্ছে যে আমি এখানে এসে থাকতে চাইতাম না। আমি কোন কারণেই হোক আমি ছোট

থাকতে আমি যদি যেতাম আমি আর আসতে চাইতাম না। কারণ আমার ছোটবেলাটা দেখা গেলো যে টানত যে আমার ওখানে থাকা দরকার। তো কোন এক কারণে দেখা গেলো যে আর থাকা হয়নি। দেখা গেলো বাবা চাইত না কারণ আমার কেরিয়ার বা ফিউচার নষ্ট হবে, পড়াশোনা করতে হবে। এক পর্যায়ে মোটামুটি বুঝলাম যখন যে না আমাকে এখানেই থাকতে হবে তো সেই হিসাবেই করা। তো মামাদের ক্ষেত্রে আমি শুনিনি তবে একটা ঘটনা এরকম যে আমার ওখানে এসেছিল বড় মামা এবং মেজ মামা, তারা একটা পর্যায়ে এসে থাকতে থাকতে, ওরা কিন্তু এখানে থাকছিল না। নানার সিদ্ধান্তে এখানে আসছে। তো আসার পরে তারা এখানে ব্যবসা করত। ব্যবসা করতে করতে, একটা পর্যায়ে প্রথমে তো তারা ব্যবসা করত না, নানার ওখানে সাপোর্ট নিয়ে থাকত, পড়াশোনা করত। তো মেজ মামা হচ্ছে চলে গেলো একবার। যেয়ে উনি আর আসবে না। আসে না আসে না তার পরে বড় মামা গেছে এন্ড মেজ মামা সরাসরি বলল যে আমি আর বাংলাদেশে যাব না। তো বড় মামা হয়তবা বাধ্যগত ছিল নানার। তো তার পরে আমি ঠিক কাহিনীটা সঠিক কিনা জানি না, পরে শুনলাম যে পুলিশ আসছিলো। পুলিশ আসার পরে বড় মামাকে পুশ ব্যাক করা হয়েছে। সে ও আসবে না, পুশ ব্যাক করা হইসে এবং মেজ মামা তখন সে গ্রাম থেকে সরে গিয়েছিল। এবং পুলিশ তাকে খুঁজে পায়নি। যার কারণে মামা যেভাবেই হোক সে ম্যানেজ করে এখানে আসেনি। তুলনামূলক আরেকটু সরল মানে নরম মেজাজের মানুষ হচ্ছে মেজ মামা। সো পরবর্তীতে আবার সিদ্ধান্ত চেঞ্জ করে বড় মামা এবং সেজ মামাকে পাঠানো হয়েছিল। এবং সেজ মামা যথেষ্টই ভালো। তো সেজ মামা এখন এখানে আছে বাট আমি তাদের এখানে এসে থাকার পরে যে কোন ব্যারিয়ার তৈরি হয়েছে এবং সামাজিকভাবে কেউ বাধা সৃষ্টি করছে এরকম কখনও শুনিনি।

ইফফাত - আচ্ছা আর আপনার ক্ষেত্রে গল্পগুলো কেমন ছিল? আপনার ছোটবেলায় এখানে আসার ক্ষেত্রে?

এম হক - আমার ছোটবেলায় আমার তো বলার খুবই আছে, আমি আব্বাকে প্রচুর ভয় পেতাম বললামই। হঠাৎ করেই আমাকে সিদ্ধান্ত মানে আমি এ জাস্ট যেদিন আসব ১৯৮৭ এর সম্ভবত ফেব্রুয়ারির কোন একদিনে। আর্লি ফেব্রুয়ারি হয়ত হবে। তো ফেব্রুয়ারিতে, তার আগের দিন আমাকে জাস্ট বলল চাচাতো ভাই, তোকে বাংলাদেশে যেতে হবে। আব্বাও বলেনি, কমিউনিকেট করেনি। তোকে বাংলাদেশে যেতে হবে, কেন তোর আব্বা বলেছে। সাইকেলে করে এসে আমাকে বোনের বাড়িতে রেখে গেছে, সাইকেলে আমাদের এখান থেকে, আমাদের বাড়ি থেকে বোনের বাড়ি এবাউট দেড় ঘণ্টা। দেড় ঘণ্টা সাইকেলের পথ। তো সাইকেলে জাস্ট সরাসরি বর্ডার ক্রসের আগে একটু খোঁজ নেওয়া যে বি বিডিআর বিএসএফ এর লাইনটাকে ক্লিয়ারেন্স আসে কিনা। এই ই, ইভেন আমি কত '৯৫ বা '৯৬, '৯৭ পর্যন্ত ঐভাবেই যেতাম। আমার কখনও যাওয়ার ইচ্ছা হলে পরে জাস্ট যেতাম, বোনের বাড়ি একদিন থাকতাম পরের দিন সকালবেলা উঠে বাড়ি যেয়ে নাস্তা করতাম। এরকম। জাস্ট সাইকেল নিয়ে বা ভ্যান নিয়ে কাউকে বলতাম যে রেখে আসো, ওখান থেকে আসার পরে আমি ওখানে বাস ছিল একটু(...) সব মিলিয়ে হয়ত এক কিলোমিটারের মত হাঁটা লাগে। যদি সাইকেল থাকে সাইকেল, যার যেভাবে এরেঞ্জমেন্ট রাখে। কখনও মটরসাইকেলে তো একঘন্টার মধ্যে বোনের বাড়ি। যে এই করতাম। তো আমি কুষ্টিয়া থাকলে পরে তখন আমি জাস্ট আগের দিন বোনের বাড়ি যেতাম পরের দিন সকাল বেলা চলে যেতাম এইভাবেই। তো এমনিতে কোন অসুবিধা এখানে হয়নি। শৈশব থেকে এক জায়গাতে চলে আসলে পরে বন্ধুবান্ধবের বা সামাজিক অবস্থা, সে মন খারাপ ছাড়া আর কিছু নাই। এখানে আস্তে আস্তে এডজাস্ট হয়ে গেলো। এখানে যখন ক্লাস নাইনে ভর্তি হই ভর্তি হবার পরে একেবারে যেহেতু নতুন পাড়ার ছেলে দিয়ে শুরু যারা পাড়ায় থাকে তাদের দিয়ে শুরু হত, তারপর যেয়ে কুষ্টিয়াতে, যা হয় আর কি সার্কেল তৈরি হয়ে যায়। ঐভাবেই সার্কেল তৈরি হয়ে গেসে। এই ই।

ইফফাত - আচ্ছা। আপনার নানার ব্যাপারটা খুব ফ্যাসিনেটিং, আপনি বলছেন উনার দুই ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছে এই দিকে, তো উনার সম্পর্কে যদি আরও কোন গল্প থাকে তাহলে একটু।

এম হক - নানার গল্প হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম আত্মীয়ই আগে থেকে আত্মীয়। নানা এরকম হবে যে আমার দাদার চাচাতো ভাই। এই টাইপের ব্যাপারগুলা হবে। এবং ঐখানে আমাদের, আমি আসলে সঠিক ইতিহাস বলতে পারব না। আমার মনে হয় যে আমাদের জমিদারি এক পুরুষ বা দুই পুরুষ টাইপের জমিদারি ছিল। ওখানে জমিদার ফ্যামিলি বলা হয়। আমাদের একটা শহরে বাড়ি আছে সেখানে রোডটার নামও জমিদারি রোড, আমাদেরই ইয়ের নামে বহরমপুর শহরে। তো আমাদের ওই এলাকাটা তিনটে ভাগে বিভক্ত ছিল। তিনটে ভাগ বলতে এটাকে তালুক বলা হত, যেভাবে তালুক বলে না, এই টাইপের। তো ঐখানে মহাল বা সামথিং কিছু বলে। তবে আমি অনেক ছোটবেলায় চলে আসছি তো, তাই জাস্ট শোনা বা নিজের মত করে বানিয়ে নেওয়া মহাল বলে। আমাদের এখন যে জায়গাটায় বাড়ি সেটা হচ্ছে ফরিদপুর, ৬ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, ঠিক পাশেই একটা আছে মোল্লা পাড়া। সেটা জিতপুর মোল্লাপাড়া, জিতপুর মোল্লাপাড়া হচ্ছে আমাদের অরিজিন। কিন্তু আমার দাদার জন্ম ফরিদপুরে। তার বাবার জন্ম হচ্ছে জিতপুর মোল্লাপাড়ায়। ওখান থেকে সে ট্র্যান্সফার, মানে বিয়ে করে এখানে। এ জায়গাটায় একটা মহাল ছিল। সেই মহালে এসে একজনকে বিয়ে করে। বিয়ে করার পরে একজন চলে আসে ওখান থেকে মানে আমার দাদার বাবা চলে আসে জিতপুর মোল্লাপাড়া থেকে এখানে। আরেকটা মহাল ছিল আমার নানির বাড়ির ঐদিকে, কুচিয়ামোড়া। কুচিয়ামোড়ায় একটা মহাল, জিতপুর মোল্লাপাড়ায় আরেকটা মহাল, আর হচ্ছে ফরিদপুরে একটা মহাল। এই তিনটে মহাল হচ্ছে আমাদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে। তার মানে খাজনাটা তখন এখান থেকে কালেক্ট করে ব্রিটিশদেরকে দেওয়া হত। তো একবার নানার খাজনা রিলেটেড প্রব্লেম হল যে সে খাজনা ব্রিটিশদেরকে দিতে পারছে না। তখন এটা নিলামে উঠবে। নিলামে উঠার আগে তখন সে চিন্তা করল এই মহালটা

যদি আমার দাদার ভাই, উনি প্রতাপশালী ছিলেন, আমার দাদা খুব একটা প্রতাপশালী ছিল না। আমার দাদার ভাইকে বলা হল তুমি আমার কাছ থেকে এটা পারচেজ নিয়ে নাও বা একটা এরেঞ্জমেন্ট করে সে একটা সেল দেখিয়ে দিচ্ছে সে যে আমি আর খাজনা দিব না, খাজনা ওরা দিবে। তুমি যদি খাজনা দিতে পার, যতদিন তুমি খাজনা দিতে পার ততদিন তুমি এটা তোমার অধিকারে রাখ। তো তখন এটা ওদের নামে করে দিল এখন দাদার ভাই সে তার নিজের নামে না নিয়ে তার মায়ের নামে নিলো টোটাল স্টেটটা। ওটাকে বিবি কুলফুন্নেসা ওয়াকফ স্টেট এর আন্ডারে, যাতে কেউ বিক্রি করতে না পারে, এটা ওয়াকফ স্টেট এটাতো উনি হয়ত জানে যে এটা ট্র্যান্সফার হয় না। জাস্ট খালি পরবর্তীতে কেয়ারটেকার চেঞ্জ হয়। একটা কমিটি থাকে কমিটিতে বাড়ির যে সবচেয়ে ভালো ছেলে বড় ছেলে সে হচ্ছে বংশ পরম্পরায় টেককেয়ার করবে। তো বিবি কুলফুন্নেসা ওয়াকফ স্টেট করল। করার পরে কিছুদিন পরে উনারা আবার এটা ফেরত চেয়েছে যখন ওদের মনে হয়েছে যে এটা ফেরত দরকার তখন এটাকে আর ফেরত দেয়নি। ফেরত না দেওয়ার ফলে কি হল যে এখন রিলেশানগুলা আমি একদম ক্লিয়ারলি বলতে পারব না। কারণ ওই যে আমার নানা, চাচাতো ভাই হতে পারে আমার দাদার, এই টাইপের অনেক কাছাকাছি সো তিনটে জায়গায়ই আমাদের লোকজন। তো পরবর্তীতে দেখা গেলো যে আমার নানার বাড়ির সামনে দিয়ে ওখানকার যত ফসল ছিল সেগুলো আমাদের লোকজন যেয়ে ওখান থেকে কেটে নিয়ে চলে আসছে, পরে দেখা গেল সে দরজা লাগিয়ে কাঁদত যে আমার এলাকারই আমার জিনিস সে এখান থেকে কেটে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তো আলটিমেটলি কি হল বংশ পরম্পরায় আমাদের ঝামেলা শুরু হয়ে গেলো যে আমরা আসলে একে অন্যের সাথে খুব সুন্দর করে একে অন্যের সাথে মিলে মিশে থাকতে পারি না। তখন সে চিন্তা করল এইরকম রিলেটিভ যদি এইরকম করে আর আলটিমেটলি সম্পত্তির কারণেই ডিভাইডেশানগুলা হবে। এবং ফলশ্রুতিতে তখন, যেমন আমার আব্বা চিন্তা করেছেন আমার নানার মতন আমরা দুই ভাইকে আলাদা করে, ওরা কিছুদিন

থাকবে ওখানে, আমরা চলে আসব সো রিলেশানগুলো ভালো থাকবে এই সেন্সে চলে আসা।

ইফফাত - আচ্ছা এই যে তিন পুরুষের জমিদারি এত স্মৃতি এগুলো ছেড়ে যে হঠাৎ করে চলে আসলেন তো আগের কথা বা ওখানকার কথা মনে পড়ত না বা মন খারাপ হত না?

এম হক - আমি কখনও জমিদারি দেখিনি । তিন পুরুষের না আমার কাছে মনে হয় ম্যাক্সিমাম দুই পুরুষের। আমি তার আগের ইতিহাস পাইনি বাট তিনটে এলাকায় ছিল । এলাকায় তিনটে ভাগে ভাগ করা ছিল হয়ত। জমিদারি বলা যাবে না কারণ জমিদারি থাকলে পরে আমি যেসব জমিদার বাড়িতে ভিজিট করি বা কোনকিছু করি সেখানে কিন্তু অনেক পূর্বপুরুষের ছবি থাকে, একটা স্মৃতি একটা ইয়ে, একটা মেমোরিয়াল হল থাকা উচিত বা কোন কিছু। আমি সেরকম কোন কিছু কখনও দেখিনি। যার কারণে আমার কাছে মনে হয়েছে যে জমিদার না বাট এলাকায় প্রভাব থাকার কারণে মনে করে অনেকে যে জমিদার বলতে পছন্দ করে, বাট আমার কাছে কোন এভিডেন্স নাই জমিদার, বাট জমি টমি যে ছিল সে ব্যাপারে কোন ইয়ে নাই। তো সে মহাল থেকে এবং আমার কাছে মনে হয় যে ওদের সম্পত্তি গুলো কিভাবে আসছে সে নিয়ে ডাউট আছে। ডাউট বলতে এই যে ব্রিটিশরা আজকে দেখা গেল খাজনা পেল না, আরেকজনকে দিয়ে দিল যে খাজনা দিতে পারে বা যে অফিস মেইন্টেন করতে পারে। সে জন্য আমার কাছে মনে হয় যে পূর্বপুরুষের ঐতিহাসিক কোন জমিদারি ভিত্তি নাই, কোন কারণে এক পুরুষ আগে আমার দাদার আগের পুরুষটা কোনভাবেই হোক সে ইয়ে ব্রিটিশদের মেইন্টেন করে কোনভাবেই হোক সে ওটা তার নামে নিয়ে নিয়েছে। এবং সেখান থেকেই শুরু আমার মনে হয়েছে। এই আর কি।

ইফফাত - আচ্ছা

এম হক - তো স্মৃতি আমার সেরকম নাই। জমিদারির কোন স্মৃতি নাই। জাস্ট গল্প শোনা যে আমরা আমাদের এখন বর্তমানে যে বাড়িটা সে বাড়িটা শুরু হয়েছিল তিনটে রুম নিয়ে, তিনটে রুম ছিল হচ্ছে আমাদের আব্বার আপন তিন ভাইকে ভাগ করে দেওয়া। প্রভাবশালী ছিল আমার দাদার বড় ভাই। সে আমাদেরকে ইয়ে করে ডিপ্রাইভ করে আমাদের তিনটে ঘর দিয়ে দেয় তোরা তিনটে ঘরে থাক। এবং সেটা ছিল কাচারি বাড়ি। এবং এখনও সেই বাড়ির ইয়ে পিলারগুলো আছে। তো সেই পিলারগুলোতে দেখা গেলো যে মানুষজনকে অত্যাচার টত্যাচার করত, খাজনা দেওয়া বা ছোটখাট ডিস্টার্ব মনে হয় করত। এই আরকি। এটুকুই খালি জানি বাট কখনই দেখা হয়নি বা কোন এভিডেন্স নাই। শুনছি এই আর কি। বাট আমি যখন থেকে আমার বুদ্ধি হয়েছে তখন থেকে আমার কাছে মনে হয়নি যে ওখানকার মানুষ আমাদেরকে খুব ভালো চোখে দেখে বা সম্মান করে। কারণ কালো হাত ভেঙ্গে দেওয়াই শুনছি। এই জন্য আমার কাছে খুব ঐভাবে ভালো স্মৃতি আমার কাছে টানে না। কারণ আমি দেখছি যে আমি যখন ক্লাস থ্রি বা ফোরে পড়ি তখন দেখা গেল বাংলা বন্ধ হত, বাংলা বন্ধ বলতে এখানে যেটাকে হরতাল বলা হয়। তো বাংলা বন্ধ হলে কারও উপর কারও অত্যাচার নাই সব অত্যাচার আমাদের উপরে। আমাদের জমিতে কেন লাঙল দিচ্ছে বা কেন ইয়ে করছি বা এই সে দিন কোন কিছুই করা যাবে না। মানে বেসিকালি যাতে আমাদের কোনকিছু না হয়। এবং জমি দখল হয়ে যাওয়া দেখছি যে আমাদের জমিগুলো দখল হয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ করে দেখা গেল ডিক্লেয়ার করল আজকে গ্রামের সব লোক আসছে, এসে বলল যে সরকার জমিটা ভেস্ট করে দিয়েছে আমাকে দিয়ে দিতে হবে। ওই দেখা গেল খুঁটিটুঁটি করে, দেখা গেলো ছোট বাড়ি টাড়ি করে দখল করে নিয়েছে। দখল করে নিয়ে থাকে। তো এই অত্যাচারগুলো দেখছি। কিন্তু আমাদেরকে যে খুব সমীহ করে বা খুব অনার করে এরকম আমি কখনও দেখিনি।

ইফফাত - আচ্ছা। তো ওখানকার আপনার ছোটবেলার সম্পর্কে আরও কিছু জানতে চাচ্ছিলাম যে কি রকম আচার অনুষ্ঠান হত বা বাড়ির পরিবেশটা কেমন ছিল।

এম হক - আমার ছোটবেলা তো আমি যে গ্রামে থাকতাম সেটা হচ্ছে ১০ বছর অবধি। তো ১০ বছর অবধি ছোটবেলায় স্কুলে, আমাদের পাশেই স্কুল, দেখা গেল এই দেড়শ একশ মিটার ডিস্টেন্সে বাড়ি থেকে স্কুল হচ্ছে, প্রাইমারি স্কুল একশ মিটার ডিস্টেন্সে। তো স্কুলে যেতাম তো গ্রামে তো ম্যাক্সিমামই হচ্ছে মানে গরিব। তো যেহেতু আমাদের বাড়ির পাশে স্কুল এবং আমার আব্বা স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারি ছিল। তো একটাই কথা বড়লোকের ছেলে, আর কিছু শুনিনি, সেরকম কোন স্মৃতি নাই, আর গভর্নমেন্ট থেকে কিছু হচ্ছে খাবার দিত। দেখা গেল যে দুপুরবেলা খাবার জন্য যে গম ভাঙ্গা বা সামথিং জাতীয় একটা জিনিস ছিল। তো সেই খাবার আমার কখনই সেভাবে খাওয়া হয়নি। তো আমি আমার মনে হয় যে এ পর্যন্ত দুই দিন আমি খেয়েছি এবং সেটা স্পেশালই ছিল। আলাদা করে দেখা গেল যে পেঁয়াজ টেয়াজ ভেজে আলাদা করে দেওয়া ছিল। কোন কারণে কেউ হয়ত খেতে চেয়েছিল বা আমাকে ওই প্রপোজ করেছিল যে একটু ভালো করে খাবো তুই বলে দিলে হবে তাহলে। এরকম কিছু একটা ঘটনা ছিল। তো খাবারগুলো আমাদের বাড়িতেই থাকত। ওই দেখা গেল যে গম ভাঙ্গা বা সামথিং কিছু একটা এই টাইপের খাবার দিত। আর তার সাথে প্রয়োজনীয় তেল টেল যা লাগে, রান্না টান্না করত, মাঝে মাঝে হয়ত ইম্প্রুভড ডায়েট দিত। তো সেগুলো খেত, তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে সে খাবারগুলো খুবই অযত্নে থাকত। ছোটবেলায় তো আসলে ওভাবে ভাবা হয়নি, তো এখন আমার কাছে মনে হয় যে আসলেই সেই খাবারে পোকা টোকা থাকত ভেতরে। তো আমাদের দুইটা রুম ছেড়ে দেওয়া ছিল যে বাইরের, দেখা গেল যে বৈঠক ঘরের পাশে তো ওখানে গাদাগাদি করে দেখা গেল একসাথে যখন বেশি লটের মাল আসত সেটা দেখা গেল বস্তায় আসল, দেখা গেল খুলে রাখা হত একসাথে একটু ড্রাই হয় তো সেখানে দেখা গেল পোকা টোকা থাকত। দেখা গেল যে মেয়েটা রান্না করে সে প্রতিদিন এসে যা প্রয়োজন

নেয়। ওর প্রয়োজন অনুযায়ী সে নিয়ে যেত। তো ওগুলো রান্না করে খেত। এই তো স্কুলে সেরকম বাধা আসলে কোন ইয়ে হয় নাই, আর যদি আমি হিন্দু মুসলিমের কথা বলি ওই ফ্রেন্ড তাইলে পরে আমাদের স্কুলে হিন্দুদের সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল। পুরো এলাকাটায় হিন্দু ছিল কয়েকটা ফ্যামিলি। তো যেই কারণে ওদের সাথে আমাদের কখনই এই টাইপের কোন প্রবলেম হয়নি এসব নিয়ে। আর কম্পারেটিভলি ওরা ভালো স্টুডেন্টই ছিল। তো টিচাররাও মোটামুটি আদর টাদর করত, এই আর আমাদের সময় এই তিন জন স্টাফই ছিল মুসলিম। এই মাঝখানে একজন হিন্দু টিচার ছিল আমি পাইনি, ভাইয়েরা পেয়েছিল। আলটিমেটলি আমার কাছে ওরকমভাবে সেরকম কোন স্মৃতি নাই। এই।

ইফফাত - আচ্ছা তার পর যে হঠাৎ করে নতুন একটা জীবন শুরু হল, নতুন একটা স্কুল, সেখানকার পরিবেশটা কেমন ছিল, সেখানকার নতুন বন্ধুরা কেমন ছিল?

এম হক - এ আমি তো সেখান থেকে চলে আসি, ওখান থেকে পাশ করে ক্লাস সেভেনে এখানে এসে যে গ্রামের স্কুলটায় ভর্তি হই মহিষকুন্ডী হাই স্কুল। তো মহিষকুন্ডী হাই স্কুলে এখানেও হচ্ছে আমি যে আমার বোনের বাড়ি থাকতাম সেখানে উনাদের মোটামুটি একটা প্রভাব ছিল যেহেতু উনার বাবা ডাক্তার। গ্রাম্য ডাক্তার যদিও। তো উনাকে অনেকেই সম্মান করত যে ডাক্তার সাহেবের রিলেটিভ। তো স্কুলের টিচাররাও চিনত বা জানত যে এটা আমার দুলাভাইয়ের নাম হচ্ছে মফিদুল, তো মফিদুলের শালা। তো সবাই জানত, টিচাররাও জানত। তো এখানেও এমন কোন কিছু প্রবলেম হয়নি, যেটা প্রবলেম হত যে আমি মিশতে চাইতাম না কারো সাথে। তো ইন্ডিয়াতে স্কুলের যারা ছেলে ছিল যারা স্কুলে ক্লাস ফোর পাশ করত সিক্স সেভেন ফাইভ সিক্স সেভেন ওখানে পড়ছি ক্লাসে ফোরের পর স্কুল চেঞ্জ হত। তো ওখানে ওই এখানে যেমন রবীন্দ্রনাথের কিছু ব্যাগ ট্যাগ থাকে না সাহিত্যের ব্যাগ ট্যাগ তো ওইরকম আমার একটা স্কুলের ব্যাগ ছিল। তো আমার ওই ব্যাগটা আমি ওখান থেকে এখানে নিয়ে আসছিলাম। তো নিয়ে আসার পরে মহিষকুন্ডী স্কুলে

আমি ভর্তি হই। তো ভর্তি হওয়ার পরে ওই বইগুলো ওই ব্যাগের মধ্যে নিয়ে আমি স্কুলে যেতাম। তো যেহেতু নতুন ছেলে তো ওখানে তো আমার ঐভাবে ফ্রেন্ডশিপ গড়ে উঠেনি। তো ওরা মোটামুটি এটা নিয়ে খুব মজা পেত। প্রথম তো বুঝতাম না যে এটা মজা পাওয়ার কোন বিষয়, সেটাতো আমি বুঝিনি। তো ওই ব্যাগ দেখা গেল মাঝে মাঝেই বইগুলো বের করে রেখে ব্যাগটা সরিয়ে ফেলত। আমি কাকে বলব। কে খুঁজে দিবে। দেখা গেল টিচারকে যেয়ে বলতাম যে স্যার আমারতো ব্যাগ হারিয়ে গেসে। টিচারতো বুঝে কারা এটা করতে পারে। দেখা গেল ডেকে টেকে বলল। একদিন দুইদিন যাওয়ার পরে তারপরে আসলে বুঝি যে ব্যাগটা নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না, পরে আমি আর ব্যাগ নিয়ে যাই নাই। এবং আলটিমেটলি এখানে তেমন বেশি ফ্রেন্ড গড়ে ওঠেনি। ওখানে দুই তিন জনের কথা মনে আছে। এছাড়া আর যাওয়াও হয় না। আমিতো দুই বছর ছিলাম ঐখানে। তো প্রথম বছরতো ঐভাবে পরিচয় হয়ে উঠার আগেই বছর কেটে গেল পরবর্তীতে যখন হল তখন তো আমি ওখান থেকে চলে আসছি। চলে আসছি কুষ্টিয়াতে। এই, সো ওইখানকার এন্ট্রিতে খুব বেশি বন্ধু বান্ধবের কথা ঐভাবে মনে নাই, দুই একজন এবং যারা পরবর্তীতে, একজন ইউনিভার্সিটির টিচার, রাজশাহী ইউনিভার্সিটির, ডক্টরেট অলসো, আরেকজন ওইখানেই পলিটেকনিকে পাশ করা, পরে জব করে, একটা এনজিও চালায়। পরে যা হয় আর কি, কমিউনিকেশন তো লেভেল ওয়াইজ হয়, তো ওখানে তো গ্রামের একেবারে, পরবর্তীতে আর ওদের সাথে যোগাযোগ নাই। কুষ্টিয়াতে চলে আসার পর তো কুষ্টিয়া স্কুলে একই ভাবে শুরু হল, ক্লাস নাইন, নাইনের পরে ফ্রেন্ডশিপ গড়ে ওঠেনি সেই সেন্সে, পাড়ার ছেলে দিয়ে শুরু, তো স্কুলের বন্ধুবান্ধবের সাথে যারা একই স্কুল থেকে কলেজে চলে আসছে তাদের সাথেই পরবর্তী কমিউনিকেশানগুলো রয়ে গিয়েছে। আর স্কুলে যারা ছিল দেখা গেল যে স্কুলে ছিল প্রায় দেড়শ জনের মত আমাদের ব্যাচে।দেড়শ জনের মধ্যে দেখা গেল আমার সাথে আমার কলেজে আসছে ৪০-৫০ জন। সেই ৫০ জনের সাথে আমার কমিউনিকেশানটা পরবর্তীতে ছিল। তারপরে সে যখন আমার কলেজ থেকে ইউনির্ভাসিটিতে গেছে ইউনির্ভাসিটিতে তাদের সাথে আরও স্ট্রং ছিল।

এভাবেই, তার মানে বাছাই হতে হতে এমন অবস্থায় গেছে যে স্কুল থেকে আমি যদি কলেজ ইউনির্ভাসিটি লাইফ দিয়ে শেষ করি তাইলে বা ৫ জন বা ১০ জন আমার সাথে পরবর্তীতে ফ্রেন্ডশিপ গুলো রয়ে গিয়েছে। ম্যাক্সিমাম ফ্রেন্ডশিপ হচ্ছে পাড়ার বন্ধুবান্ধব।

ইফফাত - আচ্ছা। কোন ধরনের পার্থক্য কি ছিল যেমন বললেন যে ওখানে বড় বাপের ছেলে বলত বা এরকম কিছু এখানে এসে হয়ত ওরকমটা ছিল না। তো এই দুই ছোটবেলার মধ্যে আসলে কোন পার্থক্য কি করতে পারেন ?

এম হক - আসলে ওইগুলো তো শুনে অভ্যস্ত ছিলাম যার কারণে আমার মনে আলাদা করে ইয়ে করত না। এফেক্ট করত না, যে আমি বড়লোকের ছেলে এইটা আমার কাছে মনে হত না। আমার কাছে এইটা মনে হত আমার নাম ডাকের মত যেমন আমাকে বাই নেম লোকে বলল মেহেদি আমার কাছে মনে হত যে আমার ওইটা নাম হয়ে গিয়েছে যে এইটা বড় বাড়ির ছেলে এবং আমার নাম বলার দরকার নাই ওদের। এইজন্য আমার আলাদা করে ওইটার কোন ইফেক্ট ছিল না। আর এখানে এসে তো আমি, আমি নিজেই আসলে একটু অন্তর্মুখী টাইপের ছেলে যার কারণে আমার এমন কিছু মনে হত না। তো মনে না হওয়ার কারণে আসলে ঐভাবে কোন ছাপ পড়েনি আমার যে আলাদা করে কেউ কোন কিছু ভাবুক বা আমাকে কেন ভাবছে না এগুলা নিয়ে আমি কখনও ভাবিনি।

ইফফাত - আচ্ছা। এবার একটু ভিন্ন ধারার প্রশ্ন করি। ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যকার যে বর্ডারটা, ফিজিক্যালি হোক বা মেন্টলি হোক এটাকে আপনি কিভাবে দেখেন ?

এম হক - ভারত বাংলাদেশের বর্ডারটা ঐভাবে কোশ্চেন করলে খুব স্বার্থপরের মত যদি বলি তাহলে পরে বলব বর্ডারটা হওয়া ঠিক হয়নি। কারণ এই বর্ডারটাই হচ্ছে আমাদের পরিবারকে ভাগ করে দিসে। এজন্য বলব যে ঠিক হয়নি। আর যদি বলেন বর্ডার

টা হওয়া জরুরি কারণ বর্ডার তো অবশ্যই কোন ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই হয়েছে তো সেটা যদি জরুরি মনে করে যারা করেছে, কারণ হয়ত তখন হিন্দুস্তান পাকিস্তান করা দরকার ছিল। সেই দরকারে যদি হয়ে থাকে তাইলে পরে বলব যে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা যেটা আগে ভাগ করা ছিল এটা বলতে পরবর্তীতে চেঞ্জ করা হইসে। সেটা এদিকে হলে পরে ভালো হত।

ইফফাত - কেন ভালো হত?

এম হক - প্রথম কথা হচ্ছে যে যদি না ভাগ হয় তাইলে সবচাইতে ভালো। তার মানে কি? আমি আমার এদিকের হোক আর ওই জায়গার হোক সব জায়গার রিলেটিভস নিয়ে আজকে আমি যেই ইন্টারভিউ দিতে যাবো সে ইন্টারভিউর প্রয়োজন পড়ত না। ঠিক একই কারণে আরেকটু স্বার্থপরের মত ভাবলে ভাগটা যেখানে অবশ্যম্ভাবী সেখানে ভাগটা আরেকটু পিছিয়ে দেওয়া গেলে যে আমি অনেকটাই সেফ জোনে থাকতাম। আমাকে আর বলতে হত না আপনি কি পশ্চিম বাংলার গল্প শুনেছেন কিনা, তখন তো এটা আপনিও জানতেন পশ্চিম বাংলার গল্প যা এখানকার গল্পও তাই। সেই সেন্সেই বলা যে আসলে হলে আমাদের এদিকটা হওয়া উচিত ছিল। ভাগ হইসে তো দ্বিজাতি তত্ত্বের উপরে। দ্বিজাতি তত্ত্বের উপরে যদি ভাগ হয় তাইলে পরে আমার এখান থেকে যে হিন্দু ট্র্যান্সফার হয়ে যাচ্ছে ওখানে, সে কেন আমার ওখানে থাকছে না। থাকছে না কারণ পরিবেশটা পুরোটাই এরকম আমাদের, আমার কুষ্টিয়ার কালচার এবং ইন্ডিয়ার কালচার, এমনিতে মানুষের কথা বলা বা কৃষিকাজ এগুলোতে তো কোন পার্থক্য নাই। পার্থক্য হইল তার ইনকাম লেবেলে। পশ্চিম বাংলা আমার কাছে মনে হয় যে ভারতের যে রাজ্যগুলো আছে সে রাজ্যগুলোর মধ্যে পিছিয়ে পড়া রাজ্য। সরকারের এটার উপর নেক নজর নাই আমার কাছে মনে হয়। সেই তুলনায় আমি যদি কুষ্টিয়ার কথা বলি বা খুলনা বিভাগের কথা বলি অনেক এগিয়ে আছে। ওখানকার ইনফ্রাস্টাকচার আর আমাদের ইনফ্রাস্টাকচারের মধ্যে অনেক পার্থক্য। আমাদের ওই গ্রামের একটা ছেলে দেখা

গেল যে কলকাতাতেও যায়নি। হোয়ারেস কুষ্টিয়ার এমন কোন ছেলে নাই যে তার ঢাকাতে একটা রিলেটিভস নাই। কারণ এখানে ১৬ কোটি বা ১৭ কোটি মানুষের দেশে ২ কোটি লোক এখানে থাকে। মনে কর প্রতি ৮ জনে একজন বাংলাদেশে এখানে থাকে। সো কোন না কোন ভাবে তার রিলেটিভস ঢাকাতে আছেই। সে ঢাকাতেই থেকে গেছে, একটা রাজধানীর যে এডমিনিস্ট্রেটিভ ইয়ে বা ফ্যাসিলিটি সেই ফ্যাসিলিটির সাথে তারা সরাসরি কানেক্টেড। হয়ত কুষ্টিয়ার একটা গ্রামে অ্যাপোলোতে ট্রিটমেন্ট করায়নি কিন্তু অ্যাপোলোতে গেসে বা অ্যাপোলোতে কি ট্রিটমেন্ট আছে সে কিন্তু জানে। কিন্তু আমি কলকাতার যে এলাকার কথা বলছি সে এলাকায় কলকাতার অ্যাপোলোতে কি হচ্ছে সে এটা চিন্তাও করতে পারে না। এই হচ্ছে পার্থক্য। শুধুমাত্র ইনকাম লেভেল তাদেরকে এভাবে ই করে রাখসে। তার মানে আমরা যে গভর্নমেন্ট, মিডিয়াতে যে ইন্ডিয়া দেখি সে ইন্ডিয়া কিন্তু ইন্ডিয়া না। সেটা ভেতরের ইন্ডিয়া। কিন্তু তার সারাউন্ডিং এরিয়ায় যত দেখা গেলো তার সব ৫টা বা ১০ টা রাজ্যের কথা যারা এখনও শিক্ষার আলোও ঠিকমত পায়নি আমার কাছে মনে হয়।

ইফফাত - আচ্ছা আমাদের সবারই তো একটি বাড়ি বা দেশের বাড়ি আছে তো সেক্ষেত্রে আপনার বা আপনি কি মনে করেন আপনার দেশের বাড়ি কোনটা?

এম হক - এইটার আসলে খুব ডিপ্লোম্যাটিক উত্তর দিতে হবে। আমি এখন আমার এ যাবৎকালের যে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে সবাইকেই একটা কথা বলেছি যে আমার বাড়ি কুষ্টিয়ায়। এখন যদি আমার বাবা কোথায় থাকে? আমার বাবা ইন্ডিয়ায় থাকে। তাহলে আমাকে কি বলতে হবে আমি যদি ঐভাবে যাই তাহলে পরে বলতে হবে আমার দেশের বাড়ি ইন্ডিয়ায়। কিন্তু আমি নিজে ফিল করি আমার বাড়ি কুষ্টিয়ায় কারণ আমার নিজের নামেই ওখানে বাড়ি আছে। এজন্য আমার বাড়ি আমার দেশের বাড়ি কুষ্টিয়ায়। এজন্য খুব ডিপ্লোম্যাটিক্যালি আমাকে বলতে হয় আমার বাবার বাড়ি ইন্ডিয়াতে কিন্তু আমার বাড়ি আমার দেশের বাড়ি কুষ্টিয়াতে কারণ

আমার সমস্ত আমি যদি আমার ছেলেবেলা বা শৈশব বা যৌবন পর্যন্ত আমি চিন্তা করি তাইলে আমার সবচাইতে বেশি সময় কেটেছে কুষ্টিয়াতে, আমার সবচাইতে আমার জীবনে প্রভাব, বন্ধুবান্ধবের যত প্রভাব সব কুষ্টিয়ার।

ইফফাত – আচ্ছা

এম হক - তার এক্সাম্পল দেই, আমাকে যদি বলা হয় বিশ্বের কোন জায়গায় তুমি ঈদ করতে যাবা? তোমাকে ঈদের ছুটি দেওয়া হল তুমি কোথায় ঈদ উদযাপন করবা। আমি অবশ্যই বলব কুষ্টিয়াতে। সেকারণে আমার বাবা মা নাই কেউ নাই কিন্তু আমি ঈদ করতে যাই কুষ্টিয়াতে এবং কুষ্টিয়ার আমার যে বাড়ি সে বাড়িতেই, নট অন্য জায়গায়। তার মানে কি? আমার ওই ওই এলাকার লোকজন বা ওই চলাফেরা বা আমার বন্ধুবান্ধব তারা আমাকে কাছে টানে ।

ইফফাত - আচ্ছা তাহলে ওখানকার খাদ্যাভ্যাস কিংবা কোন আচার অনুষ্ঠান বা কোন কালচার এগুলার কোন প্রভাব কি এখনও আপনার জীবনে আছে ?

এম হক - এটা নাই বললেই চলে । আমার কাছে মনে হয়। তবে আরেকটু স্পেসিফিকালি বললে হয়ত আমার উত্তর দিতে সুবিধা মানে কালচার বলতে মানে...

ইফফাত - হয়ত কোন একটা...

এম হক - ...কি জানতে চাচ্ছেন?

ইফফাত - ...রান্না খুব পছন্দ করে খেতেন আপনি ওখানে ছোটবেলায়। এটা আর হয়ত এখানে এসে পাচ্ছেন না। বা কোন একটা অনুষ্ঠান হয়ত ওপারে যেভাবে সেলিব্রেট

করা হত এখানে সেভাবে করা হচ্ছে না। সেখানটায় মানে আপনার জীবনে সেই ধারাগুলো ধরে রাখতে চেষ্টা করেন?

এম হক - আমার কাছে মনে হয় না যে ইন্ডিয়া মানে পশ্চিম বাংলার গ্রামীণ জীবনে সেলিব্রেশনের আলাদা করে খাওয়া দাওয়া বিষয়ক কোন মানে আছে। আমার ব্যক্তিগত মতামত। আমার কাছে মনে হয় না এরা খাওয়া দাওয়া যেমন আমি দেখি যে ওখানে ঈদ হচ্ছে। আমি ওখানে একটা ঈদ করেছি বা পুজা হয় একটা গ্রামে ওখানে। তো সেই পুজায় বা ঈদে ঈদের নামাজ পড়ে আসার পরে আমাকে কেউ ইনভাইট করে না ঐভাবে। যে তুমি আমার বাসায় এস বা তোমরা আসো। ঐভাবে করে না। আমি যাই, যাওয়ার পর দেখা গেল যে সঙ্গত কারণেই ওরা ২/১ টা মিষ্টান্ন খাবার টাবার করে। দেখা গেল যে অ্যাজ এ সুন্নত তারা পালন করে যে নামাজ পড়তে যাবার আগে মিষ্টিমুখ করে যেতে হয়। তো সেগুলো ওরা করে মানে খুবি মিনিমাল। এখানে যেমন ঈদ মানে এক সপ্তাহ আগে থেকে বোঝা যাবে, রোজার ঈদে তো এক সপ্তাহ আগে থেকে বোঝা যাবে এক সপ্তাহ পরেও বোঝা যাবে যে একটা উৎসব উদযাপন হল। সেটা ওখানে হয়ত পুজা হয়। তো ঈদের ক্ষত্রে ওখানে এ সেই তো খাওয়া দাওয়ার তেমন কোন ভূমিকা তো আমি দেখছিনা। কারণে আমাকে যদি কেউ ইনভাইট না করে, আমাকে যদি যাওয়ার পরে দেখা গেল যে দুইটা আইটেম তো আমার কাছে মনে হয় না খুব বেশি কিছু। দুইটা আইটেম কি খুব বেশি কিছু। আমার বাসায় আসলে পরে আপনার ঈদ লাগবে না, এমনিতেই দুইটা আইটেম খেতে পারবেন। সো আমার কাছে মনে হয়েছে যে আলাদা করে খাওয়া দাওয়ার কোন ইয়ে নাই। তো আমার কাছে ওদের খাওয়া দাওয়ার তেমন কোন ইয়ে নাই। তবে হ্যাঁ ছোটবেলায় আমাদের যেটা হত যে আমাদের বাড়িতে সরিষা তেল দিয়ে রান্না হত, রান্নার আলাদা একটা ইয়ে থাকেই যে স্মৃতি থাকে যে দেখা গেল কম খাবার থাকলে বা আলাদা করে খাবার থাকলে সে খাবার কোন এক সময় ভাল লেগে যায়। তো সেই ভালো লাগা থেকে মাঝে মাঝে মনে হয় আচ্ছা মুরগির মাংসটা দেশি মুরগি সরিষা তেল দিয়ে রান্না

করি তাইলে পরে হয়ত আমার মায়ের মত হতে পারে। তো এইটা খাবার ভালো লেগেছিল। তো সেইটা ভালো লাগা বাট সেটা কন্টিনিউ করতে হবে আমি সেটা ফিল করি না। দেখা গেল মাঝে মাঝে আমার সরিষা তেলের খাবার খাওয়া দরকার আমি দেখি তো এইটা কেমন লাগে বা একটা তাজা মাছ কিনলাম তাজা মাছটা মনে করেন আমাদের পুকুর ছিল। তাজা মাছটা কিভাবে রান্না করলে হয়, দেখি তো সেই টেস্ট পাওয়া যায় কিনা। গল্প শুনি আমাদের পুকুরে অনেক টেস্টি মাছ ছিল। বাট আমি কখনও খাইনি বা পাইনি, তা আমার কাছে মনে হয় যে সেরকম কিছু না। এই সরিষার তেল এটাই মাঝে মাঝে মনে হয়। তবে ঢাকাতে তো আর চুলায় রান্না করা সম্ভব না। সো চুলার টেস্টও নাই, এটা মিলবেও না। সো যুক্তি দিয়েও যদি চিন্তা করি তাইলে পরে ওইটা কোন ভাবেই এটাকে ক্যারি ফরোয়ার্ড করা যাবে না। সো এটা আমার কাছে সেরকম কোন কিছু মিন করে না।

ইফফাত - আচ্ছা ভালো হোক খারাপ হোক তারপরও অনেক কিছু তো স্মৃতিতে আছে । এখন আপনি কি চাইবেন যে এ স্মৃতিগুলো আপনার পরবর্তী প্রজন্ম জানুক? আর যদি জানতেই হয় বা জানাতেই হয় তাহলে কোন গল্পগুলো আপনি জানাতে চাইবেন?

এম হক - ঐভাবে উল্লেখযোগ্য কোন আমার কাছে মনে হয় না আমার পরবর্তী জানানোর আমার লাইফে কিছু। কারণ আমি অনেক ছোটবেলায় চলে আসছি। এখন আমার সন্তান যদি জানতে চায় যে আমার দাদার ইতিহাস বা ওর দাদার ইতিহাস তাহলে পরে হয়ত আমাকে সে গল্পগুলো বলতে হবে যে আমার দাদা এরকম ছিল বা তোমার দাদা এরকম ছিল, এই তার পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল। সে হয়ত কোন কিছু দেখতে চাইলে পরে সাক্ষী হিসাবে আমি সেখানে নিয়ে যেতে পারব যে এ জায়গাটা হচ্ছে তোমার দাদার ইয়ে বসবাস বা আমার দাদা এখানে এসেছিল, এই দেখানো। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় না যে, আমার কাছে সবসময় নেগেটিভই মনে হয়েছে ইন্ডিয়ার যত কালচার আমার কাছে নেগেটিভই মনে হইসে । সেইটা যদি মানবিক মুল্যবোধের জায়গায় যদি আমি আমার মেয়েকে তাদের সব ইতিহাস বলি তাহলে

পরে আমার কাছে নেগেটিভ ইফেক্ট পড়বে বলে মনে হয়। আমি চাইব সেটাকে সযত্নে এড়িয়ে যেতে এবং যেটা আমি আমার ওয়াইফের ক্ষেত্রেও করি যে আমার ইতিহাস আমার পূর্বপুরুষের ইতিহাস সবখানি ওর জানার দরকার নাই। যেটা ভালো সেটা দেখে গেল একটু জানল। বাট পুরোপুরি আমার কাছে মনে হয় না ওখানে তেমন কিছু ছিল।

© 2016 Goethe-Institut e.V.– all rights reserved